OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 05
Website: https://tirj.org.in, Page No. 38 - 47
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, Published on January issue 2025, Page No. 38 - 47
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

ইকোফেমিনিজম তত্ত্ব : ক্যারেন জে. ওয়ারেন ও ভাল প্লামউডের তত্ত্বের আলোকে ভারতীয় পৌরাণিক নারী চরিত্রের সামাজিক অবস্থা বিশ্লেষণ

সাদিয়া আফরিন
জ্যেষ্ঠ প্রভাষক, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ
ইউনিভার্সিটি অফ লিবারেল আর্টস বাংলাদেশ [ইউল্যাব]
Email ID : sadia.afrin@ulab.edu.bd

Received Date *20. 12. 2024*
Selection Date *01. 02. 2025*

Keyword
Ecofeminism, mythology, women, nature, oppression, Warren, Plumwood, dual values, qualitative change.

Abstract

Since the beginning of the world, women and nature have been identified as identical. A woman's creativity, endurance, and generosity are like a reflection of nature in a woman's body. Like nature, women are the guardians of life. Similarly, both women and nature are neglected and oppressed in patriarchal society. Women's marginalization and biodiversity loss go hand in hand. The theory of ecofeminism was formed to protect women's rights and prevent environmental degradation. Man's oppression of nature and patriarchy's dominance over women are inextricably linked. In the late 20th century, Françoise d'Eaubonne coined the term ecofeminism in her book 'Le Feminismeou la mort'. But it can be seen that in our Indian subcontinent, the myth-puranas that have been prevalent for ages have always been about the connection between nature and women and oppression. Ecofeminism's prominent philosopher Karen J. Warren and Val Plumwood in their essays 'The Power and Promise of Ecofeminism' and 'Feminism and the Mastery of Nature' analyze the theory of ecofeminism to reveal the oppression of women and nature by patriarchal society. They think that it will be possible to reduce the inequality between men and women only if there is a qualitative change in the values of the people living in the society. Though Daupradi born from fire, Sita born from earth or Shakuntala protected by birds are all associated with nature, they are burdened by the cruel blows of this patriarchy. On the other hand, when the qualitative change of the society is achieved, characters like Gargi, Satyavati, Maitrayi, Lopamudra, Amba or Shikhandi are found who are wise, intelligent and skilled. This Article will show through Warren and Plumwood's Ecofeminism theory how patriarchal society has dominated women in Indian mythology due to dual values. On the other hand, if the qualitative change of the society is achieved, the process of changing the social

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 05
Website: https://tirj.org.in, Page No. 38 - 47
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

status of women will be revealed in this article by analyzing the character of mythical women.

Discussion

নারী ও প্রকৃতি এক ও অভিন্ন। প্রকৃতির মতোই নারী প্রাণের প্রতিপালক। পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারী ও প্রকৃতি উভয়ই অবহেলিত, নিপীড়িত। নারীর প্রান্তিকীকরণ এবং জীববৈচিত্র্যের বিনাশ পরস্পর সহযোগী। নারী ও প্রকৃতির মধ্যে থাকা এই সম্পর্ক থেকেই গড়ে উঠেছে নতুন এক তত্ত্ব। যাকে ইকোফেমিনিজম বা পরিবেশ নারীবাদ হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। নারীর ন্যায্য অধিকার ও পরিবেশ বিপর্যয় রোধকল্পেই ইকোফেমিনিজমের জন্ম। প্রকৃতির ওপর মানুষের নিপীড়ন ও নারীর ওপর পুরুষতন্ত্রের আধিপত্য দুটোই যেন একসূত্রে গাঁথা। ১৯৭৪ সালে ফ্রাঁসোয়া দ্য ওবোঁন (Françoise d'Eaubonne) তাঁর 'লে ফেমিনিজম উলামো' (Le Feminismeou la mort) গ্রন্থে 'ইকোফেমিনিজম' প্রত্যয়টি সর্বপ্রথম ব্যবহার করেন। ইকোফেমিনিজম বা পরিবেশ নারীবাদের সংজ্ঞা হিসেবে বলা যায় -

> "Ecofeminism is a movement that sees a connection between the exploitation and degradation of the natural world and the subordination and oppression of women. It emerged in the mid-1970s alongside second-wave feminism and the green movement. Eco-feminism brings together elements of the feminist and green movements, while at the same time offering a challenge to both. It takes from the green movement a concern about the impact of human activities on the non-human world and from feminism the view of humanity as gendered in ways that subordinate, exploits and oppress women."[১]

বিংশ শতাব্দীর গুরুত্বপূর্ণ দার্শনিক যথাক্রমে ক্যারেন জে. ওয়ারেন, ভাল প্লামউড, বন্দনা শিবা, মারে বুকচিন, মারিয়া মাইজ, জিম চেনি প্রমুখ ইকোফেমিনিজম তত্ত্বের নতুন দ্বার উন্মোচন করেছেন। তাঁরা সবাই নারী নিপীড়ন ও প্রকৃতির নিপীড়নের মধ্যে সাদৃশ্য প্রত্যক্ষ করেছেন। পরিবেশের প্রতি মানুষের অবাধ অধিকার রয়েছে। এ ধারণা থেকে মানুষ পরিবেশকে তাঁর নিজের ইচ্ছে মতো ব্যবহার করে পরিবেশ অবনয়নের সৃষ্টি করছে। নারীবাদী দার্শনিকরা মনে করেন, পরিবেশ অবনয়ন ও পরিবেশ নিপীড়ন নারীবাদী ইস্যু। তার কারণ হচ্ছে, পরিবেশ শোষণ করলে যেমন পরিবেশ নিপীড়িত হয় তেমনি নারীর উপর শোষণের ফলে নারী নিপীড়িত হয়। পরিবেশ ও নারী উভয়ই পুরুষশাসিত সমাজের দৃষ্টিভঙ্গির কারণে নিপীড়িত, শোষিত ও বিপর্যস্ত হয়ে পড়ছে। নারীবাদীরা এই দৃষ্টিকোণ থেকে নারী ও প্রকৃতির মধ্যে সাদৃশ্য বা মিল খুঁজে পান।

> "পরিবেশ অবনয়নকে তাঁরা তাই নারী বিষয়ক ইস্যু হিসেবে গ্রহণ করেন।"[২]

ক্যারেন জে. ওয়ারেন তাঁর 'The power and promise of Ecological Feminism' প্রবন্ধে ও ভাল প্লামউড তাঁর 'Feminism and the Mastery of Nature' প্রবন্ধে ইকোফেমিনিজম তত্ত্ব বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে নারী ও প্রকৃতির প্রতি পুরুষতন্ত্রের কর্তৃত্ব এবং কীভাবে পিতৃতান্ত্রিক দ্বৈততা নারী ও পরিবেশ নিপীড়নের জন্য দায়ী তা প্রকাশ করেছেন। পুরুষতান্ত্রিক সমাজ নারীকে 'প্রকৃতিকরণ' এবং প্রকৃতিকে 'নারীকরণ' করার মাধ্যমে উভয়ের উপর নিপীড়ন চালায়। নারীর প্রকৃতিকরণ করা হয় যখন নারীকে প্রকৃতির বিভিন্ন উপকরণ বা উপাদান রূপে চিহ্নিত করা হয়। তেমনি প্রকৃতির নারীকরণ করা হয় যখন প্রকৃতিকে 'She' বলা হয় এবং 'মাতা' হিসেবে ব্যাখ্যা দেয়া হয়। তাই ওয়ারেন মনে করেন যে, পুরুষতন্ত্র যখন নিজেকে প্রকৃতির মালিক বা মনিব মনে করে, তখন প্রকৃতির মতো নারীকেও একই দৃষ্টিতে দেখে। প্রকৃতির সঙ্গে নারীর এই অনিবার্য সম্পর্কের কারণে নারী ও প্রকৃতি উভয়ই নিগৃহীত হচ্ছে। ওয়ারেন তাঁর 'The Power and Promise of Ecological Feminism' প্রবন্ধে নারী ও প্রকৃতির নিপীড়নকে 'ধারণাগত কাঠামো' বলে আখ্যায়িত করেন।[৩] ধারণাগত কাঠামো বলতে তিনি এমন কিছু মৌলিক বিশ্বাস, মূল্যবোধ, অনুমান ও দৃষ্টিভঙ্গিকে বোঝান, যা ব্যক্তিকে নিজস্ব ধারণা গঠন করতে সাহায্য করে। এ ধারণাগুলো হল সমাজের বদ্ধমূল ধারণা; আর এই বদ্ধমূল ধারণা পুরুষতান্ত্রিক সমাজেরই সৃষ্টি। পুরুষতন্ত্র নিজেদের উচ্চাসনে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যই এই ধারণা তৈরি করেছেন যে, পুরুষ শ্রেষ্ঠ আসনে অধিষ্ঠিত আর নারী তার অধস্তন।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 05
Website: https://tirj.org.in, Page No. 38 - 47
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

নারী ও প্রকৃতির এই নিপীড়নের পিছনে সবচেয়ে বড় কারণ হচ্ছে পুরুষতান্ত্রিক সমাজে সৃষ্ট দ্বৈত মূল্যবোধ। দ্বৈত মূল্যবোধ থেকে মানুষের মনে এই ধারণা তৈরি হয়েছে যে, নারী ও প্রকৃতি হল অধস্তন আর এদের ওপর কর্তৃত্ব করার অধিকার রয়েছে এবং এই কর্তৃত্ব করবে পুরুষতন্ত্র। তাই,

> "পরিবেশবাদীরা একমত যে নারী ও প্রকৃতির মধ্যে এক গভীর সম্পর্ক রয়েছে।"[৪]

প্রাচীন সমাজ প্রতিষ্ঠার পর থেকেই এই মূল্যবোধ জন্মাতে শুরু হয়েছে যে, নারী ও প্রকৃতি দুর্বল এবং পুরুষতন্ত্রের অধস্তন। নারী আবেগময়ী, পরনির্ভরশীল, সিদ্ধান্ত নিতে অক্ষম অন্যদিকে পুরুষ শক্তিশালী, সাহসী, আত্মপ্রত্যয়ী ও স্বনির্ভর এই ধারণায় সমাজ লালন করে আসছে। পরিবেশ নারীবাদ পুরুষতন্ত্রের এই নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনের প্রয়াশ চালায়। ওয়ারেন ও প্লামউড দুইজনেই নারী ও প্রকৃতি নিপীড়নের অন্যতম কারণ হিসেবে পুরুষতান্ত্রিক সমাজের দ্বৈত মূল্যবোধকে দায়ী করেছেন। ওয়ারেনের মতে, -

> "পীড়নমূলক ধারণাগত কাঠামো যখন পিতৃশাসিত হয় তখন তা নারীকে অধস্তন হিসেবে ব্যাখ্যা করে।"[৫]

বিখ্যাত নারীবাদী দার্শনিক সিমোঁন দা বোভোয়ার দেখিয়েছেন সমাজে নারীর পরিচয় হচ্ছে দ্বিতীয় লিঙ্গ (Second Sex) হিসেবে। নারী ও পুরুষ সমান ভূমিকা রাখা সত্ত্বেও মূল্যায়িত হচ্ছে 'অপর' হিসেবে। অপরপক্ষে প্রকৃতি মানুষের জীবনে অফুরন্ত সম্পদ দান করলেও প্রকৃতিকে মানুষ সহায়ক মূল্য হিসেবে গণ্য করে। সমাজের এই দ্বৈত মূল্যবোধের কারণেই নারী ও প্রকৃতির প্রতি মানুষের মূল্যায়ন এইরকম। সিমোঁন, ওয়ারেন, প্লামউডের পাশাপাশি বন্দনা শিবাও মনে করেন পুরুষতন্ত্র নারীদের অধীনস্থ করে রাখার জন্য সমাজে দ্বৈত মূল্যবোধ তৈরি করে রেখেছে।

ওয়ারেন ও প্লামউড নারী ও পুরুষের জীবতাত্ত্বিক পার্থক্যকে (নারী দুর্বল ও হীন এবং পুরুষ সবল ও উচ্চ প্রকৃতির) কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা বৈষম্যের বিরুদ্ধে সোচ্চার। তাঁরা জীবতাত্ত্বিক পার্থক্যকে স্বীকার করেন কিন্তু সমাজ নির্মিত লিঙ্গকেন্দ্রিক বৈষম্যকে স্বীকার করেন না। প্লামউড মনে করেন, -

> "সমাজ নারীকে স্বতঃমূল্য সত্তা হিসেবে গণ্য করলে নারী সমাজে দ্বিতীয় শ্রেণির সত্তা অর্থাৎ সহায়ক ভূমিকা পালনকারী সত্তা হিসেবে গণ্য হতো না।"[৬]

তাছাড়া নারীর মূল্যবোধ, নারীর অনুভূতি কখনো পুরুষের পক্ষে উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। নারীর Care attitude (নারীর আবেগ, অনুভূতি, পরিচর্যানীতি) নারীকে পুরুষ থেকে ভিন্ন করেছে। ওয়ারেনের মতে, নারীদের অনুভূতিগুলো ব্যক্তিক যা সার্বিক নয়। আর নারীদের অনুভূতিগুলো সার্বিক নয় বলেই পুরুষতন্ত্র এগুলোকে অগ্রাহ্য করে, কারণ পুরুষতান্ত্রিক সমাজের সর্বজনীন ধারণা হচ্ছে ব্যক্তিককে গুরুত্ব না দিয়ে নৈর্ব্যক্তিককে গুরুত্ব দেয়া। ফলে নারী তার ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়। নারীর জীবনের কিছু অভিজ্ঞতা (গর্ভপাত, গর্ভধারণ) আছে, যা পুরুষ কখনো উপলব্ধি করতে পারে না। পুরুষের মধ্যেও Loving বা Affection এর বোধ কাজ করে তবে তা নারীর মতো নয়। নারী ও পুরুষের মধ্যে প্রকৃতিগত পার্থক্য রয়েছে এবং তাকে স্বীকার করতে হবে ও মর্যাদা দিতে হবে। পুরুষতান্ত্রিক সমাজকে নারীর অভিজ্ঞতা, নারী প্রেক্ষিত ও নারী মূল্যবোধকে গুরুত্ব দিতে হবে। নারী ও প্রকৃতিকে সহায়ক মূল্য হিসেবে গ্রহণ করা বন্ধ করে স্বতঃমূল্য সত্তা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। আর হয়তো তখনি মানুষের মূল্যবোধের গুণগত পরিবর্তন সাধিত হতে পারে। মানুষের মূল্যবোধের পরিবর্তন করা সম্ভব হলেই সমাজের পরিবর্তন নিশ্চিত করা যাবে। তাই সমাজের গুণগত পরিবর্তন সাধিত হলেই প্রকৃতপক্ষে নারী ও প্রকৃতির ওপর নিপীড়ন, বৈষম্য দূরীকরণ সম্ভব বলে মনে করেন ওয়ারেন ও প্লামউড।

সভ্যতার শুরু থেকেই নারীই মূলত প্রকৃতিকে দিয়েছে এক সুশৃঙ্খল সুন্দর রূপ। আদি নারী ইভ বা হাওয়া প্রকৃতির প্রতি অসীম কৌতূহল বশত স্বর্গের বাগানে রাখা সেই নিষিদ্ধ ফল খেয়ে ফেলেছিল। আর সেই অপরাধের শাস্তি হিসেবে নারীকে নিক্ষিপ্ত করা হয় পৃথিবীর প্রতিকূল অরণ্য প্রকৃতিতে। গাছের পাতা আর বাকলে নিজের দেহকে আবৃত করে নারীই প্রথম প্রকৃতিকে মানুষের বন্ধু করে নেয়। প্রাচীনকালে নারীর হাত ধরেই শুরু হয় আদি কৃষিব্যবস্থা। একদিকে মানব সমাজ গঠন অন্যদিকে প্রকৃতির সঙ্গে জীবনের যোগসূত্র দুটোই গড়ে উঠেছে নারীর হাত ধরে। তাই প্রাচীনকাল থেকেই বিভিন্ন ধর্মে নারীকে দেখা হয়েছে সৃষ্টি ও সমৃদ্ধির ঈশ্বর বা দেবী হিসেবে। আদি নারী ইভ প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের যোগাযোগ তৈরি করে গেছেন; নারীজাতির প্রতিনিধি হয়ে প্রকৃতির প্রতি মানুষের আগ্রহ ও কৌতূহলকে জাগিয়ে

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 05
Website: https://tirj.org.in, Page No. 38 - 47
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

তুলেছিলেন। তেমনি সনাতন ধর্মে দেবী পার্বতীকে (দূর্গা) মনে করা হয় প্রকৃতির দেবী। তিনি বিদ্যা, বুদ্ধি, শক্তি ও জ্ঞানরূপে সর্বভূতে বিরাজ করেন। জীবনের জন্য (প্রকৃতিতে) অবধারিত সমস্ত শক্তি যেমন ধন, ধান, বিদ্যা, শিল্প ইত্যাদির দেবীরূপে নারীকেই বন্দনা করা হয়। এমনকি শুধু ভারতীয় মিথ-পুরাণে শুধু নয় গ্রিক মিথেও লক্ষ করা যায়, ভেনাস ও আফ্রোদিতে হচ্ছেন প্রকৃতির সাথে মানুষের জীবনকে সম্পদে, সম্মানে, প্রেমে ও বীর্যে গৌরবময় করে তোলার শক্তিরূপিণী দেবী। আফ্রোদিতের হাতে থাকে প্রেমের প্রতীক আপেল। জীবনের শক্তি ও আনন্দের সঙ্গে আদিকাল থেকেই নারী ও প্রকৃতির যে অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক রয়েছে এই শক্তিময়ী দেবী তারই প্রতীক।

নারী ও প্রকৃতির এই যোগসূত্রতার কথা বিংশ শতাব্দীর শেষভাগে ইকোফেমিনিজম ধারণার মাধ্যমে প্রকাশিত হলেও, আমাদের ভারতীয় উপমহাদেশে যুগ যুগ ধরে যে মিথ-পুরাণ প্রচলিত আছে তাতে প্রকৃতি ও নারীর যোগসূত্রতা এবং নিপীড়নের বিষয়টি সর্বদাই প্রচলিত। 'পুরাণ' অর্থাৎ প্রাচীন কথা বা প্রাচীন কাল সম্বন্ধীয় শাস্ত্র।[৭] পুরাণ শব্দটি আক্ষরিক অর্থ "পুরাতন হলেও প্রকৃত পক্ষে তা সর্বকালীন মানবজীবনে চির নতুন অর্থে ব্যবহৃত হয়ে আসছে।"[৮] কারণ প্রকৃতপক্ষে পুরাণ সাহিত্য প্রাচীন ভারতবর্ষের একটি জীবন্ত ইতিহাস। ভারতীয় পুরাণের বিস্তার খ্রিস্টপূর্ব ৫০০০ থেকে শুরু করে খ্রিস্টের জন্মের পর কয়েক শতাব্দী পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ব্যক্তির দ্বারা লিখিত, পরিবেশিত, পরিবর্তিত, পরিবর্ধিত ও সংকলিত নানান আদি গ্রন্থ, মূলত ধর্মগ্রন্থে লক্ষ করা যায়। যেমন - বেদ ও উপনিষদ, উপবেদ, বেদান্ত, স্মৃতি সংহিতা, গীতা, পুরাণ, আগমশাস্ত্র, রামায়ণ, মহাভারত, চণ্ডী এবং ষড়দর্শন। এইসব আদি ধর্মগ্রন্থ ও পুরাণে নানান দেবদেবীর কর্মকাণ্ড এবং তাঁদের বন্দনা ও উপাসনার পদ্ধতি যেমন ভাবে লিপিবদ্ধ রয়েছে তেমনি এই মিথ পুরাণের কাহিনির মধ্যে নারী ও প্রকৃতির অভিন্নতা ও নিপীড়নের বিষয়টিও সমানভাবে লক্ষণীয়। যেমন বলা হয়, মহাভারতের কথা অমৃতসমান। কিন্তু মহাভারতের অনেক স্থানেই নারী সম্পর্কে মনুসংহিতার প্রভাব লক্ষণীয়। মহাজ্ঞানী পিতামহ ভীষ্মের উপলব্ধি "মানুষের চরিত্রে যত দোষ থাকতে পারে, সব দোষই নারী ও শূদ্রের চরিত্রে আছে। জন্মান্তরীয় পাপের ফলে জীব স্ত্রীরূপে (শূদ্ররূপেও) জন্মগ্রহণ করে।" (ভীষ্মপর্ব ৩৩/৩২) মহাভারতে আরো বর্ণিত আছে "তুলাদন্ডের একদিকে যম, বায়ু, মৃত্যু, পাতাল, দাবানল, ক্ষুরধার বিষ, সর্প ও বহ্নিকে রেখে অপরদিকে নারীকে স্থাপন করিলে ভয়ানকত্বে উভয়ই সমান সমান হবে।" (অনুশাসনপর্ব ৩৮) নারীর স্বাধীনতা সম্পর্কে মনুসংহিতায় বর্ণিত আছে "অস্বতন্ত্রাঃ স্ত্রিয়ঃ কার্য্যাঃ পুরুষৈঃ স্বৈর্দ্দিবানিশম্/ বিষয়েষু চ সজ্জন্ত্যঃ সংস্থাপ্যা আত্মনো বশে।।" (৯ : ২) "পিতা রক্ষতি কৌমারে ভর্ত্তা রক্ষতি যৌবনে/ রক্ষতি স্থবিরে পুত্রা ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যমর্হতি।।"(৯ : ৩) অর্থাৎ স্ত্রীলোকদের স্বামীসহ প্রভৃতি ব্যক্তিগণ দিনরাত পরাধীন রাখবেন, নিজের বশে রাখবেন...; স্ত্রীলোককে পিতা কুমারী জীবনে, স্বামী যৌবনে ও পুত্র বার্ধ্যক্যে রক্ষা করে; (কখনও) স্ত্রীলোক স্বাধীনতার যোগ্য নয়।[৯]

পুরাণের নারীচরিত্রগুলো পর্যালোচনা করলে নারীর সঙ্গে প্রকৃতির সম্পর্কের বিষয়টি অনুধাবন করা যায়। ওয়ারেন ও প্লামউড তাঁদের প্রবন্ধে নারী ও প্রকৃতির উপর পুরুষতন্ত্রের যে কর্তৃত্বের কথা বলেছেন তা পৌরাণিক নারী চরিত্র বিশ্লেষণের মধ্যে পরিলক্ষিত হয়। পুরুষতান্ত্রিক সমাজের দ্বৈত মূল্যবোধের শিকার পৌরাণিক নারী চরিত্রগণ। শকুন্তলা, দ্রৌপদী কিংবা সীতা যেমনভাবে প্রকৃতির সঙ্গে সম্পৃক্ত তেমনি তাঁরা পুরুষতন্ত্রের নির্মম আঘাতে জর্জরিত। আবার ওয়ারেন ও প্লামউড এই নিপীড়নের সমাধান হিসেবে যে সমাজের গুণগত পরিবর্তনের উল্লেখ করেছেন সেটা সম্ভব হলে গার্গী, সত্যবতী, মৈত্রয়ী, লোপামুদ্রা ও অম্বা থেকে শিখণ্ডী হয়ে ওঠা প্রতিবাদী, সাহসী, বিদূষী পৌরাণিক নারীচরিত্রগুলোর উদাহরণও আমরা দেখতে পাই। গবেষণা প্রবন্ধের এই পর্যায়ে ওয়ারেন ও প্লামউডের ইকোফেমিনিজম তত্ত্বের আলোকে ভারতীয় পৌরাণিক নারীদের সামাজিক অবস্থান আলোচনার করার প্রয়াশ করা হল -

শকুন্তলা : ঋষি বিশ্বামিত্র ও অপ্সরা মেনকার মিলনের ফলে মেনকার গর্ভে জন্ম হয় শকুন্তলার। শকুন্তলার জন্মের পর বিশ্বামিত্র মেনকাকে ছেড়ে দিলে মেনকাও তাঁর সদ্যোজাত কন্যাকে বন-মধ্যে মালিনী নদীর তীরে পরিত্যাগ করে ইন্দ্রসভায় প্রস্থান করেন। "এই পরিত্যক্ত কন্যা শকুন্ত মানে পাখি দ্বারা রক্ষিত হয় বলেই তাঁর নাম হয় শকুন্তলা।"[১০] কণ্বমুনির আশ্রমে প্রকৃতির একান্ত সান্নিধ্যে বেড়ে ওঠে প্রকৃতির কন্যা শকুন্তলা। কণ্বের তপোবনে মানুষ আর মানবেতর প্রাণিরা নির্বিবাদে

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 05
Website: https://tirj.org.in, Page No. 38 - 47
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

বাস করে। সেই তপোবন পুরুষতান্ত্রিক সমাজের প্রতিনিধি দুষ্মন্ত এলেন প্রকৃতির উপর তাঁর স্বেচ্ছাচারিতা প্রকাশ করতে। তিনি (দুষ্মন্ত) অরণ্যের মানুষ নন। তিনি নির্বিবাদে প্রকৃতির উপর নিজের কর্তৃত্ব প্রকাশ করতে চেয়েছেন মৃগ হত্যার মাধ্যমে। পরবর্তীতে দুষ্মন্তের শকুন্তলাকে কথা বিস্মৃত হওয়া ও তাঁকে প্রত্যাখানের মধ্যে দিয়ে একদিকে যেমন প্রকৃতির উপর তাঁর নিয়ন্ত্রণ করার মানসিকতা প্রকাশিত হচ্ছে আর অন্যদিকে পিতৃতান্ত্রিক মানসিকতার দ্বৈত মূল্যবোধের প্রকাশও লক্ষণীয়। অপরদিকে শকুন্তলা পতিগৃহে যাবার সময় পশুপক্ষী, গাছপালা সবাই কেঁদে উঠেছে। শকুন্তলাকে পতিগৃহ পাঠানোর সময় কণ্ব তপোবন তরুদের সম্বোধন করে বলেন -

> "হে সন্নিহিত তরুগণ! যিনি তোমাদের জলসেচন না করে কদাচ জলপান করতেন না, ভূষণপ্রিয়া হয়েও কদাচ যিনি তোমাদের পল্লবভঙ্গ করতেন না, তোমাদের কুসুমপ্রসবের সময় উপস্থিত হলে যাঁর আনন্দের সীমা থাকত না, সেই শকুন্তলা আজ পতিগৃহে যাচ্ছেন, তোমরা সকলে অনুমোদন করো।"[১১]

এই উক্তি থেকে শকুন্তলার সঙ্গে প্রকৃতির সম্পর্কের জায়গাটি স্পষ্ট হয়। শকুন্তলার নিজস্ব পরিচিত স্থান থেকে বেরিয়ে আসার কারণে দুষ্মন্তের রাজসভায় শকুন্তলা প্রচণ্ডভাবে বিচ্ছিন্ন অনুভব করেছেন। কালিদাস এই চিন্তা থেকেই বলতে চেয়েছেন মানুষ প্রকৃতির কাছাকাছি যতক্ষণ থাকে ততক্ষণে সে সুখে থাকে, প্রকৃতির বাইরে গেলেই তার মানসিক সংকট শুরু হয়। ওয়ারেন ও প্লামউড পুরুষতান্ত্রিক সমাজের যে দ্বৈত মূল্যবোধের কথা বলেছেন, তাঁর প্রমাণ শকুন্তলা চরিত্রটি। প্রকৃতির সঙ্গে জড়িত শকুন্তলা পিতৃতান্ত্রিক মানসিকতার প্রতিভূ দুষ্মন্ত কর্তৃক পরিতাজ্য হওয়ার মধ্যে দিয়ে সমাজের দ্বৈত মূল্যবোধের পরিচয় প্রকাশিত হয়।

সীতা : রামায়ণে বর্ণিত মিথিলার রাজা জনকের কন্যা। হল দ্বারা যজ্ঞভূমি কর্ষণ করার সময় জনক সীতাকে লাঙ্গলের রেখায় প্রাপ্ত হন। ক্ষেতে হল মুখ থেকে উৎপন্ন বলে এঁর নাম সীতা।[১২]

প্রকৃতিজাত সন্তান সীতা জীবনসঙ্গী হিসেবে গ্রহণ করেন পুরুষোত্তম রামচন্দ্রকে। পুরুষতান্ত্রিক সমাজের দ্বৈত মূল্যবোধের আরেকটি উত্তম নিদর্শন লক্ষ করা যায় রাম চরিত্রের মধ্য দিয়ে। রাম-সীতার বিবাহের পর রাজা দশরথ রামকে রাজা হিসেবে অভিষিক্ত করার সংকল্প গ্রহণ করলে দশরথ পত্নী কৈকেয়ীর প্রার্থনায় রামের বনবাস ও ভরতের রাজ্যলাভ হয়। পরবর্তীতে রাবণ সীতাকে অপহরণ করলে নিজের পৌরুষ প্রমাণ করে রাবণকে পরাজিত করে তিনি সীতাকে উদ্ধার করেন। কিন্তু যখনি যুদ্ধে জয়লাভের পর সীতা রামের নিকট উপস্থিত হয়, রাম সীতার চরিত্র নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেন এবং সীতাকে যথা ইচ্ছে যেতে বলেন। পুরুষতান্ত্রিক সমাজে পুরুষ জাতি নিজেকে শ্রেষ্ঠ ও নারীকে তার অধস্তন চিন্তা করে বিধায় রামচন্দ্র নিজের পুরুষত্ব প্রমাণ করার জন্য রাবণের বিপক্ষে যুদ্ধ করেছেন স্ত্রীকে উদ্ধার করার জন্য। কিন্তু যুদ্ধ পরবর্তী সময়ে বিশ্বাসের স্থানে আর রাখতে পারছেন না তাঁর সহধর্মিণীকে। সীতা প্রকৃতির সন্তান, মাটির ফলা থেকে উদ্ভূত হয়ে তাঁর জন্ম, সেই সীতাকেই পুরুষতান্ত্রিক সমাজের দ্বৈত মূল্যবোধের শিকার হয়ে নিজের সতীত্ব প্রমাণের জন্য অগ্নিপরীক্ষা দিতে হয়েছে। এমনকি তাঁর সতীত্ব প্রমাণের পরও প্রজাদের সন্তুষ্টির জন্য রাম সীতাকে নির্বাসিত করেছে বাল্মীকির আশ্রমে। রাম যখন জানতে পারেন সীতার পুত্র লব ও কুশ, তখন তিনি নিজের বংশের অগ্রগতির চিন্তায় আবারো সীতাকে গ্রহণ করতে চাইলেন। শর্ত এবারও আত্মশুদ্ধি দিয়ে শপথ নেয়া। এই পর্যায়ে এসে নিজের সতীত্ব পরীক্ষা দিয়েছেন, নিজেকে সতী প্রমাণ করতে গিয়ে ভূমিজ সীতা পৃথিবী দেবীর আশ্রয় চেয়েছেন এবং বসুমতী তাঁকে উভয় বাহুতে ধারণ করে রসাতলে প্রবেশ করেন। মাটি থেকে উত্থিত সীতা চিরতরে মাটিতে হারিয়ে গেলেন। সীতা নির্দোষ হওয়া সত্ত্বেও পুরুষতান্ত্রিক সমাজের দ্বৈত মূল্যবোধের শিকার হয়েছেন বারংবার। তেমনি রাম রাবণের যুদ্ধের পর রাম যখন রাবণকে বধ করেন তখন রামের ইচ্ছায় বিভীষণ রাবণের বিধবা স্ত্রী মন্দোদরীকে বিয়ে করেন। কিন্তু মন্দোদরী যুদ্ধে রাবণের সঙ্গে রামের বিরুদ্ধে অস্ত্র চালনা করেছিলেন। রাবণের ভাই হয়েও বিশ্বাসঘাতকতা করে রামের সঙ্গে হাত মিলানো বিভীষণকে বিয়ে করতে মন্দোদরীর মত ছিল কিনা তা রাম বা বিভীষণ বিবেচনা করেন নাই। কারণ পুরুষতান্ত্রিক এই সমাজে নারী পুরুষের অধস্তন এই চিন্তা থেকেই হয়তো মন্দোদরীর সিদ্ধান্ত জানার প্রয়োজন মনে করেননি তাঁরা। এমনকি

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 05
Website: https://tirj.org.in, Page No. 38 - 47
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

লঙ্কা যাওয়ার পথে রাম ও বানরজাতি কর্তৃক সাগরের বুক ছিড়ে বানানো সেতুও প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করার একটি উদাহরণ। পিতৃতান্ত্রিক এই সমাজে পুরুষ প্রকৃতি ও নারীর উপর এইভাবেই তাঁদের নিপীড়ন চালিয়ে যান।

দ্রৌপদী : মহাভারতের নায়িকা দ্রৌপদী। পাঞ্চালরাজ যজ্ঞসেন অরূপে দ্রুপদ তাঁর বাল্যবন্ধু আচার্য দ্রোণকে বধ করার জন্য যজ্ঞ শুরু করেন। যেই যজ্ঞবেদীর যজ্ঞাগ্নি থেকে আবির্ভূত হলেন এক নারী তারই নাম দ্রৌপদী। দ্রৌপদীর স্বয়ংবর সভায় সমক্ষে লক্ষ্যভেদ করে দ্রৌপদীর বরমাল্য লাভ করেন অর্জুন। কিন্তু দ্রৌপদীকে নিয়ে কুন্তীর নিকট উপস্থিত হলে কুন্তী না দেখেই আদেশ দেন "তোমরা সকলে মিলেই সেই জিনিস ভোগ কর।"[১৩] দ্রৌপদী কেবল এক স্বামী অর্জুনকে চাইলেও তাঁকে পঞ্চস্বামীকে মেনে নিতে হয়। দ্রৌপদীর ইচ্ছে-অনিচ্ছার বিষয়টি পুরুষতান্ত্রিক সমাজ গণ্য করেননি। পুরুষশাসিত সমাজের দ্বৈত মূল্যবোধের জায়গাটি এমন যে, দ্রৌপদীকে প্রতিবার একস্বামী থেকে অন্য স্বামীর কাছে যাওয়ার আগে আগুনের মধ্য দিয়ে হেঁটে গিয়ে নতুন করে সতীত্ব ও পবিত্রতা অর্জন করতে হত। কিন্তু স্ত্রী দ্রৌপদীকে রেখে অর্জুন ব্রহ্মচর্যের জন্য বনবাসে গিয়ে তিন তিনটি বিয়ে করে ঘরে ফিরেন তবে তাঁকে অবশ্যই এই শুদ্ধ বা পবিত্র হতে হয়নি। পুরুষশাসিত সমাজে একজন নারীর উপর যত অত্যচার হওয়া সম্ভব তার সবই ঘটেছিলো অগ্নি থেকে উদ্ভূত দ্রৌপদীর উপর। পৃথিবীর বিখ্যাত চার আদি মহাকাব্যের অন্যান্য নারী চরিত্রগণ দ্রৌপদীর মতো এত লাঞ্ছনা সহ্য করেননি। পুরুষের লোভ, লালসা ও বাসনার শিকার হতে হয়েছিল পেনেলোপিকেও তবে তা অডিসিয়াসের অনুপস্থিতে। স্বামীর অনুপস্থিতে সীতাকে রাবণ হরণ করে নিয়েছিল কিন্তু তথাকথিত পঞ্চপাণ্ডব ভুবনজয়ী স্বামীদের উপস্থিতিতে দ্রৌপদীর উপর যে লাঞ্ছনা হয় তা সত্যি অবিশ্বাস্য। এমনকি দুর্যোধন পান্ডবদের দ্যূতক্রীড়ায় আহ্বান করলে সেখানে সব হারিয়ে যুধিষ্ঠির দ্রৌপদীকে পণ রাখেন। পুরুষতান্ত্রিক সমাজে দ্বৈত মূল্যবোধের ফলে পুরুষরা নিজেদেরকে নারীদের প্রভু হিসেবে গণ্য করেন আর তাই হয়তো দ্রৌপদীর মতামত ছাড়াই তাঁকে খেলার পণ করা হয়েছে। এমনকি যখন যুধিষ্ঠির পাশা খেলায় হেরে গেল তখন সে একটিবারও তাঁকে রক্ষা করতে এগিয়ে আসেননি বা স্ত্রীর অপমানের প্রতিবাদ করেননি। এইভাবেই প্রকৃতির সঙ্গে সম্পৃক্ত যজ্ঞবেদী উদ্ভূত দ্রৌপদী পুরুষতান্ত্রিক সমাজের দ্বৈত মূল্যবোধের শিকার হয়েছেন বারংবার। প্রাচ্য-পুরাণে লক্ষ করা যায়, সতীত্ব সর্বদা নারীরই পালন করতে হয়। পঞ্চতন্ত্রে বলা আছে, নারীরা তখনই কেবল সতী যখন তার আর কোনো সুযোগ নেই বা প্রার্থীপুরুষ নেই। স্মৃতিশাস্ত্রে সরাসরি পুরুষের প্রভুত্ব আর নারীর দাসত্বের উল্লেখ রয়েছে। তাই ওয়ারেন ও প্লামউডের ইকোফেমিনিজম তত্ত্বের আলোকে দ্বৈত মূলবোধ ধারণাটি স্পষ্ট ভাবে এই চরিত্রগুলোর মধ্যে প্রকাশ পায়।

পুরাণ অধ্যয়ন করলে আরো উপলব্ধি করা যায় পুরুষতান্ত্রিক সমাজের দ্বৈত মূল্যবোধের জায়গাটি; এমনকি পুরাণের ছত্রে ছত্রে নারীবিদ্বেষ ও নারীর অধস্তনতার বিষয়টি লক্ষণীয়। উপনিষদের বিখ্যাত ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য নারীকে নিজের দেহের অধিকার থেকেও বঞ্চিত করেছেন। বৃহদারণ্যক উপনিষদে রয়েছে : সম্ভোগে অনিচ্ছুক স্ত্রীকে প্রথমে মিষ্টি কথা বলতে হবে, তাতেও সম্মত না হলে বস্ত্র এবং অলংকার দিয়ে রাজি করাতে হবে। তাতেও সম্মত না হলে হাত দিয়ে, লাঠি দিয়ে তাকে প্রহার করতে হবে। ওয়ারেন ও প্লামউড নারীদের Care Attitude এর কথা বলেছেন যা পুরুষ থেকে ভিন্ন তারও উদাহরণ মিথ-পুরাণে লক্ষ করা যায়। পুরাণের অনেক স্থানে লক্ষ করা যায় মুনি-ঋষিরা যৌনকাতর হয়ে পড়ে এবং শারীরিক ক্ষুধা মিটলেই তাঁরা সঙ্গে সঙ্গে সেখান থেকে চলে যেতেন। সেই অনাগত নারীর সন্তানের কোনো দায়িত্ব বা সংবাদ তাঁরা নিতেন না। সন্তানের সব দায়িত্ব পড়তো মায়ের উপর। স্বয়ং অর্জুন চিত্রাঙ্গদার সঙ্গে আর দুষ্মন্ত শকুন্তলার সঙ্গে একই কাজ করেছেন। তাঁরা তাঁদের সন্তানের কথা বেমালুম ভুলে গিয়েছিলেন। কিন্তু চিত্রাঙ্গদা ও শকুন্তলার তাঁদের সন্তানের প্রতি সবসময় দায়িত্ববান ছিলেন।

ওয়ারেন ও প্লামউড বলেছেন নারী ও প্রকৃতিকে সহায়ক মূল্য হিসেবে গ্রহণ করা বন্ধ করে স্বতঃমূল্য সত্তা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। তাঁরা সমাজের গুণগত পরিবর্তনকে নিশ্চিত করার কথা বলেছেন। সমাজের গুণগত পরিবর্তন সাধিত হওয়া যে সম্ভব তারও নিদর্শন আমরা মিথ-পুরাণের চরিত্র থেকে পাই। গার্গী, মৈত্রেয়ী, লোপামুদ্রা তাঁরা বিদুষী নারী ছিলেন। তাঁরা দর্শন রচনা ও চর্চা করতেন, জ্যোতিষ ও জ্যোতির্বিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন, তাঁদের আয়ত্তে তীর-

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 05
Website: https://tirj.org.in, Page No. 38 - 47
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

ধনুক চালনা, জাদুবিদ্যা, শিক্ষকতা ও গুরুর দায়িত্ব ছিল। সবচেয়ে বড় বিষয় তাঁরা তথাকথিত পুরুষতন্ত্রের বিপক্ষে প্রশ্ন করতে পেরেছেন। সাধারণ ও বিশেষ জ্ঞানে পুরুষদের সমকক্ষ ছিলেন তাঁরা এবং পুরুষদের সঙ্গে প্রকাশ্য সভায় বসে তাঁদের সঙ্গে আলোচনা, তর্ক-বির্তকে অংশগ্রহণ করারও উল্লেখ রয়েছে। তাঁদের কারো কারো বেশ কিছু শিষ্যও ছিল। তাই বলা যায় সমাজের মানুষের গুণগত পরিবর্তন সাধিত হলে এই ধরনের প্রতিবাদী, বিদুষী নারী চরিত্রও সমাজে উঠে আসা সম্ভব। যেমন -

গার্গী : বৈদিক যুগের একজন বিদুষী ঋষিকন্যা। ইনি গর্গমুনির কন্যা। "বেদের অনেক সূক্ত ও মন্ত্রের রচয়িতা এই ব্রহ্মবাদিনী গার্গী।"[১৪] মিথিলার রাজা জনকের যজ্ঞে জনক শ্রেষ্ঠ বিদ্বান ও ব্রহ্মিষ্ঠ নির্ণয়ের ঘোষণা দিলে মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য নিজেকে এর যোগ্য বলে ঘোষণা দেন। গার্গী সেই সভায় যাজ্ঞবল্ক্যের সাথে বিচার করতে শুরু করেন। যাজ্ঞবল্ক্যকে তিনি প্রশ্নবাণে জর্জরিত করতে সক্ষম হন। পুরুষতান্ত্রিক সমাজের প্রতিভূ যাজ্ঞবল্ক্যকে প্রশ্ন করার এই সৎসাহসেই গার্গীকে প্রাচীন ভারতের অন্যতম শক্তিমতী ও ব্রহ্মবাদিনী নারী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। পুরুষতান্ত্রিক সমাজের দ্বৈত মূল্যবোধের ফলে নারী ও প্রকৃতিকে নিয়ে যে 'ধারণাগত কাঠামো' গড়ে উঠেছে, পুরুষই যুক্তি-বুদ্ধির অধিকারী সে স্থান থেকে গার্গী নিজেকে মুক্ত করতে পেরেছেন। ওয়ারেন ও প্লামউড ঠিক এই প্রসঙ্গেই পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীর আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য নারীদের স্বতঃমূল্য সত্তা প্রকাশের কথা বলেছেন।

মৈত্রেয়ী : বৈদিক যুগে নারীজাতি যে শিক্ষার সুযোগ লাভ করে ও দার্শনিক সমাজে খ্যাতি অর্জনে সক্ষম হতেন, তার উদাহরণ হিসেবে মৈত্রেয়ীর নাম উল্লেখ করা যায়। তাকে ভারতীয় বিদূষীদের এক প্রতীক মনে করা হয়। তিনি ছিলেন যাজ্ঞবল্ক্যের স্ত্রী। তিনি ব্রহ্মবিদ্যা অনুসরণ করেছিলেন এবং তাঁর জ্ঞানার্জন স্পৃহা ছিল অদম্য। যাজ্ঞবল্ক্য যখন সংসার আশ্রম ত্যাগ করার কথা বলেন তখন মৈত্রেয়ীর সমস্ত অন্তর বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। তিনি তখন বিত্ত দ্বারা অমরত্ব লাভ করা সম্ভব কিনা এই বিষয়ক প্রশ্ন করেন তাঁর স্বামীকে। যজ্ঞবল্ক্য যখন তাঁকে উত্তর দিলেন বিত্তদ্বারা অমৃতত্ব লাভের সম্ভবনা নেই, মৈত্রয়ী তখন জীবনের পরম সত্য আবিষ্কার করলেন। তারপর তিনি তাঁর স্বামী যজ্ঞবল্ক্যকে অমরত্বের ব্যাখ্যা দিতে বললেন। মৈত্রেয়ী প্রশ্ন করার মধ্য দিয়ে তাঁর যুক্তি বুদ্ধির পরিচয় যেমন দিয়েছেন। একই ভাবে পুরুষতান্ত্রিক সমাজ কর্তৃক সৃষ্ট দ্বৈত মূল্যবোধকে ভেঙ্গে সহায়ক সত্তা থেকে স্বতঃমূল্য সত্তায় উপনীত হয়েছেন। বৃহদারণ্যকোপনিষদ্ গ্রন্থে উল্লেখ আছে, যাজ্ঞবল্ক্যের সঙ্গে এই কথোপকথনের মাধ্যমে তিনি হিন্দু দর্শনের আত্মা-সংক্রান্ত ধারণাটি পর্যালোচনা করেছেন। এই ধারণা থেকেই অদ্বৈত দর্শনের মূল কথা যা একজন নারী আবিষ্কার করেছেন। এই থেকে অনুধাবন করা যায়, পুরুষতান্ত্রিক সমাজে সৃষ্ট ধারণাগত কাঠামোতে নারীকে যেভাবে সহায়ক সত্তা হিসেবে বিবেচনা করা হয় গার্গীর মতো মৈত্রেয়ীও সেটির পরিবর্তন দেখিয়েছেন। আর তাই ওয়ারেন ও প্লামউডের ইকোফেমিনিজম চিন্তার আলোকে বলা যায়, মানুষের গুণগত পরিবর্তনের পাশাপাশি সমাজের গুণগত পরিবর্তন সাধিত হলেই মৈত্রয়ীর মতো চরিত্র সমাজে উঠে আসা সম্ভব।

লোপামুদ্রা : নিজের ব্যক্তিত্বকে বলবান রাখার এক আদর্শ প্রকাশ হচ্ছে লোপামুদ্রা। তিনি মহর্ষি অগস্ত্যের সহধর্মিণী। যিনি "নারীদের রূপাভিমান লোপ করেন এবং স্রষ্টার সৃষ্টিকে মুদ্রিত (চিহ্নিত) করেন।"[১৫] অগস্ত্য চিরকাল অকৃতদার থাকার সংকল্প গ্রহণ করলেও তাঁর পিতৃপুরুষের কথায় তাঁর নিজের জীবনসঙ্গিনী তিনি তাঁর কল্পনায় সৃষ্টি করলেন। বিদর্ভরাজা তখন সন্তান কামনায় তপস্যারত থাকায় লোপামুদ্রাকে তাঁর কাছে অর্পণ করলেন। লোপামুদ্রা পূর্ণ যৌবনাবতী হলে অগস্ত্য তাঁকে প্রার্থনা করলেন। লোপামুদ্রা তাঁর সমস্ত স্বপ্নসৌধ দিয়ে নিঃস্ব রিক্ত ঋষির জন্য নিজেকে প্রস্তুত করলেন। কিন্তু বিবাহের পর অগস্ত্যের অনুভূতিহীন মনোভাব লোপামুদ্রার স্বপ্নকে ধূলায় মিশিয়ে দিয়েছে। কিন্তু একদিন অগস্ত্য লোপামুদ্রার প্রতি তাঁর ভালেবাসা অনুভূত হলে সে লোপামুদ্রাকে আহ্বান করেন। লোপামুদ্রা সে আহ্বানে সাড়া দেন ঠিকই কিন্তু তাঁর সেই হাসি, প্রাণচাঞ্চল্য আর প্রকাশিত হয় না। অগস্ত্য সেই হাসি, প্রাণচাঞ্চল্যকে প্রত্যাশা করলে লোপামুদ্রা তাঁকে রত্ন-আভরণ নিয়ে আসতে বলেন। অগস্ত্য রিক্ত ঋষি প্রার্থী হয়ে বিভিন্ন রাজ্য পরিভ্রমণ করে লোপামুদ্রার জন্য অজস্র রত্ন নিয়ে

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 05
Website: https://tirj.org.in, Page No. 38 - 47
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

আসেন। কিন্তু লোপামুদ্রা অনাবরণ অঙ্গশোভায় একটি বল্কলে আবৃত হয়েই অগস্ত্যের কাছে আসেন। অগস্ত্য প্রশ্ন করলে তিনি বলেন যে, -

> "আমি রত্ন প্রেমিকা নই ঋষি। আমার স্মিত হাসি দেখার লোভে যাঁর হৃদয় আজ ব্যাকুল হয়েছে, আমি তাঁরই প্রেমিকা।"[১৬]

এইভাবে লোপামুদ্রা নিজের জীবনের খেলায় বিজয়িনী হয়েছেন। ভালোবাসার সংগ্রামে জয়যুক্ত হয়েছেন। ওয়ারেন তাঁর প্রবন্ধে নারীর আবেগ, অনুভূতি, পরিচর্যানীতিকে পুরুষের আবেগ থেকে ভিন্ন বলেছেন। পুরুষ শাসিত সমাজে নারীর আবেগ ও অনুভূতিকে সার্বিক মনে না করে সেগুলোকে গুরুত্ব দেওয়া হয় না। যেমনটি লক্ষ করা যায় লোপামুদ্রার ক্ষেত্রে। প্রথমে তাঁর অনুভূতির বা আবেগকে গুরুত্ব দেয়নি অগস্ত্য কিন্তু সেটির বিপক্ষে দাঁড়িয়ে নিজের ভালোবাসাকে অর্জন করে নিয়েছেন এই সংগ্রামী নারী। প্লামউড যেমনটি বলেছেন, নারীকে সহায়ক সত্তা থেকে বেরিয়ে স্বতঃমূল্য সত্তায় বিবেচনা করতে হবে। পুরুষতান্ত্রিক সমাজে এইভাবেই লোপমুদ্রা স্বতঃমূল্য সত্তা প্রকাশ করতে পেরেছেন।

সত্যবতী : সত্যবতী চেদীরাজ উপরিচর বসু এবং শাপগ্রস্তা মৎস্যরূপিণী অপ্সরা অদ্রিকার কন্যা। ধীবরদের রাজা দাশ তাকে তার যমজ ভাইয়ের সাথে অদ্রিকার উদরে পান। রাজা বসু পুত্র সন্তানটিকে নিজের কাছে রেখে সত্যবতীকে দাশের কাছে প্রতিপালন করতে দেন। সত্যবতীর গায়ে তীব্র মাছের গন্ধ থাকায় তার আরেক নাম মৎস্যগন্ধা। এজন্য কেউ তার কাছে আসতে চাইতো না। তাই পালকপিতার নির্দেশে তিনি যমুনার বুকে নৌকা চালানো আর জেলেনী হিসেবে কাজ করতেন। পরবর্তীতে রাজা শান্তনু তার সৌন্দর্য ও গায়ের সৌরভে মুগ্ধ হয়ে তার প্রেমে পড়েন এবং দাশরাজের কাছে বিবাহের প্রস্তাব করলে দাশ বলেন যদি তার কন্যার সন্তানেরা রাজা হন তবেই তিনি কন্যাদান করবেন। এজন্য শান্তনুর জ্যেষ্ঠপুত্র ভীষ্ম রাজা হননি। সত্যবতী শান্তনুর মাধ্যমে চিত্রাঙ্গদ ও বিচিত্রবীর্যের জন্ম দেন। চিত্রাঙ্গদকে সিংহাসনে রেখে ভীষ্মই রাজকার্য চালান আর এই আদেশ দিয়েছেন স্বয়ং রাজমহিষী সত্যবতী। গন্ধর্বরাজের সঙ্গে যুদ্ধে চিত্রাঙ্গদ প্রাণ হারালে বিচিত্রবীর্যকে রাজ্য অভিষিক্ত করা হয়। বিচিত্রবীর্যের বিবাহ হয় অম্বিকা আর অম্বালিকার সঙ্গে। কিন্তু কোনো সন্তানের জন্ম দেয়া ছাড়াই মৃতুবরণ করলেন বিচিত্রবীর্য। রাজবংশের বাতি এগিয়ে নিতে সত্যবতী তখন অত্যন্ত সাহসী পদক্ষেপ নেন। তিনি তাঁর আরেকপুত্র মহর্ষি দ্বৈপায়নকে অম্বিকা ও অম্বালিকার গর্ভে সন্তান দিয়ে হস্তিনাপুরের রাজ্যকে বাঁচানোর জন্য আহবান করেন। তাঁর অভিলাষ পূর্ণ হয়। অম্বিকার গর্ভে ধৃতরাষ্ট্র আর অম্বালিকার ঘরে পাণ্ডুর জন্ম হয়। সত্যবতীর দীর্ঘ জীবন পর্যালোচনা করলে তাঁর চরিত্রের বলিষ্ঠ প্রকাশ সহজেই চোখে পড়ে। নদী পারাপারের সহজ সরল জীবনযাত্রা থেকে উঠে আসা সাহসী, বুদ্ধিদীপ্ত এক নারী যিনি রাজপরিবারের জটিল অনেক পারিবারিক পরিস্থিতিতেও দৃঢ় মানসিকতার পরিচয় দিয়েছেন। পুরুষতান্ত্রিক সমাজের অধীনে থাকা অনেক সমস্যার সমাধান করেছেন যা তাঁর অসামান্য ব্যক্তিত্বকে প্রকাশ করে। পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীদের স্বতঃমূল্য সত্তাকে প্রকাশ করার সুযোগ দিলেই সত্যবতীর মতো দৃঢ় মানসিকতার চরিত্র সমাজে উঠে আসা সম্ভব। শান্তনু ও ভীষ্ম যেভাবে সত্যবতীকে সহায়ক সত্তা হিসেবে না ভেবে তাকে স্বতঃমূল্য সত্তা বা তাঁর মত প্রকাশের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন, এটিই প্রয়োজন সমাজের গুণগত পরিবর্তনের জন্য।

অম্বা থেকে শিখণ্ডী : অম্বা কাশীরাজের প্রথম কন্যা। ভীষ্ম বিচিত্রবীর্যের বিবাহের জন্য অম্বা, অম্বিকা ও অম্বালিকাকে হরণ করে আনেন। সলজ্জ অম্বা ভীষ্মকে জানান, তিনি পূর্বেই মহারাজ শাল্বকে মনে মনে বরণ করে নিয়েছেন। ভীষ্ম তখন অম্বাকে শাল্বরাজের কাছে পাঠিয়ে দিলে শাল্ব অম্বাকে প্রত্যাখ্যান করেন। নিজের উপর হওয়া অন্যায় থেকে অম্বা তপস্যায় রত হন। পরশুরামে সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হলে, পরশুরাম ভীষ্মকে অনুরোধ করেন অম্বাকে গ্রহণ করার জন্য। ভীষ্ম অস্বীকার করলে, গুরু-শিষ্যের তুমুল সংগ্রাম হয় এবং পরশুরামের পরাজয় ঘটে। মানুষের হাতে ভীষ্মের সংহার সম্ভব নয় বলে অম্বা শিবের তপস্যা শুরু করেন। শিব আর্শীবাদ করেন অম্বা পরবর্তী জন্মে দ্রুপদ রাজার ঘরে প্রথমে কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করবেন - পরে পুরুষদেহ পাবেন। বর পাওয়ার পর অম্বা চিতাগ্নির মধ্যে প্রাণত্যাগ করেন। এই পিতৃতান্ত্রিক সমাজে নারীর

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 05
Website: https://tirj.org.in, Page No. 38 - 47
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

হৃদয়ের মূল্য না দিয়ে তাকে বস্তু বা সহায়ক সত্তা হিসেবে চিন্তার বিপরীতে প্রতিবাদী হয়ে উঠেছে অম্বা। তাঁর সাধনা ও আত্মত্যাগের মধ্যে তাঁর প্রতিবাদেরই জ্বলন্ত প্রকাশ লক্ষ করা যায়।

পরবর্তীতে অম্বা দ্রুপদ রাজার ঘরে জন্ম গ্রহণ করেন। শিখণ্ডী পরবর্তীতে পুরুষ হবে ভেবে হিরণ্যবর্মার কন্যার সঙ্গে শিখণ্ডীর বিবাহ দেন দ্রুপদের স্ত্রী। কিন্তু কিছুদিন পর সব জানাজানি হলে দ্রুপদের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হন হিরণ্যবর্মা। এই অবস্থায় মনঃক্ষুণ্ন হয়ে প্রাণত্যাগ করবেন বলে শিখণ্ডী অরণ্যে চলে যান। সেখানেই স্থূণাকর্ণ নামে এক যক্ষ বাস করতো। সে সমস্ত বিষয়ে জ্ঞাত হয়ে তাঁর পুরুষত্ব শিখন্ডীকে দান করেন। আর তারপর শিখণ্ডী ধনুর্বেদ শিক্ষা গ্রহণ করে নিজেকে ভীষ্ম বধের জন্য প্রস্তুত করেন। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে শিখণ্ডী নয়টি বাণ নিক্ষেপ করেন ভীষ্মের বক্ষে আর শিখণ্ডীকে সামনে রেখে অর্জুন ভীষ্মকে শরাঘাতে জর্জরিত করেন। আর এইভাবেই পূর্বের জন্মের প্রতিজ্ঞা পূরণ করেন অম্বা অরূপে শিখণ্ডী। অম্বা থেকে শিখণ্ডী হয়ে ওঠার এই যাত্রাতে আমরা দেখি এক নারীর সংগ্রাম ও নিজের প্রতিজ্ঞাকে পূরণ করার লক্ষ্যে। পুরুষতান্ত্রিক সমাজ যখন অম্বার অনুভূতিকে মূল্য না দিয়ে তাকে সহায়ক শক্তি হিসেবে বিবেচনা করেছে, সেই স্থান অম্বা শিখণ্ডী হয়ে ওঠার মধ্য দিয়ে নিজের স্বতঃমূল্য সত্তাকে প্রকাশ করেছেন। পুরুষশাসিত সমাজের অধীন থেকেও শিব, দ্রুপদ, স্থূণাকর্ণ যে মানবিক গুণাবলির পরিচয় দিয়েছেন তাঁর হাত ধরেই সমাজের গুণগত পরিবর্তন সাধিত হওয়া সম্ভব। আর সমাজের গুণগত পরিবর্তন সাধিত হলেই অম্বা থেকে শিখণ্ডীর হয়ে ওঠা সম্ভব।

তাই বলা যায়, পুরাণের পরতে পরতে নারীদের অধস্তনতার কাহিনি লিপিবদ্ধ। পুরুষতান্ত্রিক সমাজ নারী ও প্রকৃতিকে নিজের অধীনস্থ ভাবতে পছন্দ করেন, তারই প্রকাশ এই পৌরাণিক চরিত্ররা। সমাজের দ্বৈত মূল্যবোধের শিকার হওয়া নারীরা যুগ যুগ ধরে চিহ্নিত হয়ে আসছে সমাজের সহায়ক সত্তা হিসেবে। প্রকৃতপক্ষে তখনি সমাজে ভারসাম্য আসবে যখন সমাজের গুণগত পরিবর্তন সাধিত হবে এবং নারী ও প্রকৃতি সহায়ক সত্তা থেকে স্বতঃমূল্য সত্তায় প্রকাশিত হবে। ক্যারন জে. ওয়ারেন ও ভাল প্লামউড তাঁদের ইকোফেমিনিজম তত্ত্বে এই বিষয়টিই প্রকাশ করেছেন। পৌরাণিক নারীর সামাজিক অবস্থান আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা দেখতে পাই, পরিবেশ নারীবাদ তত্ত্বটি তুলনামূলক আধুনিক একটি চিন্তা কিন্তু ভারতীয় এই সমাজে হাজার বছর ধরে প্রচলিত মিথ-পুরাণে নারীর সঙ্গে প্রকৃতির সম্পর্ক ও পিতৃতান্ত্রিক সমাজে নারী এবং প্রকৃতির উপর নিপীড়ন, অধস্তন করে রাখার ইতিহাস প্রচলিত রয়েছে। মিথ-পুরাণে নিপীড়নের চিত্র যেমন ভাবে লক্ষ করা যায় ঠিক তেমনি প্রতিবাদী, সাহসী, বিদুষী নারী চরিত্রও লক্ষ করা যায়, যারা সমাজের গুণগত পরিবর্তন সাধন করতে সক্ষম হয়েছেন। ওয়ারেন ও প্লামউড নারী ও প্রকৃতির উপর নিপীড়ন বন্ধের জন্য যে সমাধানের কথা বলেছেন (সমাজের গুণগত পরিবর্তন) তা সম্ভব তখনি, যখন ব্যক্তি পর্যায়ে সবার মূল্যবোধের গুণগত পরিবর্তন সাধিত হবে।

Reference:

১. Mary, Mellor (1997) *Feminism & Ecology*, New york University Press, New york, USA; P. 1

২. খানম, রাশিদা আখতার (২০০৫) *নারীবাদ ও দার্শনিক প্রেক্ষাপট*, সাহিত্যিকা, বাংলা বাজার, ঢাকা, পৃ. ৭০

৩. Warren, K. J. (1997) *The power and promise of Ecological Feminism* in H. LaFollete, ed, Ethics in Practice, Blackwell, Oxford; P. 658

8. Tong, Rosemarie Putnam (1998) *Feminist Thought*, West View Press, USA, P. 247

৫. Warren, K. J. (1997) *The power and promise of Ecological Feminism* in H. LaFollete, ed., Ethics in Practice, Blackwell, Oxford; P. 658

৬. Plumwood, Val. (1993) *Feminism and the Mastery of Nature*, Routledge, London, P. 21

৭. দাস, সচ্চিদানন্দ (২০১৬) *বাংলা সাহিত্যে পুরাণ ও পৌরাণিক কথাসাহিত্য*, পুস্তক বিপণি, কলকাতা- ৭০০০০৯, পৃ. ১৯

৮. ভুঁইয়া, আর কে (২০১৬) *মিথ-পুরাণ ও জৌতিষ বিজ্ঞান*, রেডিক্স সার্ভিস, ঢাকা- ১২১৭, পৃ. ১৮

৯. সিংহ, কঙ্কর (২০০৫) *মনুসংহিতা ও নারী*, র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন, কলকাতা, পৃ. ৭২-৮০

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 05
Website: https://tirj.org.in, Page No. 38 - 47
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

১০. সরকার, সুধীরচন্দ্র (১৩৩৫) *পৌরাণিক অভিধান*, দাস অফসেট প্রসেসর, কলকাতা - ৭০০০৩৬, পৃ. ৩৩৮
১১. বিদ্যাসাগর, ঈশ্বরচন্দ্র(২০১৪) *শকুন্তলা*, বিদ্যাসাগর রচনাবলী (প্রথম খণ্ড), তুলি-কলম, কলকাতা - ৯, পৃ. ১৩১
১২. সরকার, সুধীরচন্দ্র (১৩৩৫) *পৌরাণিক অভিধান*, দাস অফসেট প্রসেসর, কলকাতা - ৭০০০৩৬, পৃ. ৪৩৭
১৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯২
১৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১১
১৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮৬
১৬. বন্দ্যোপাধ্যায়, শুভেন্দ্রনাথ (২০১৮) *মহাভারতের নারী*, অক্ষরবিন্যাস, শ্যামাচারণ দে স্ট্রিট, কলকাতা৭০০০৭৩, পৃ. ১৩